

সেকুলারিজম প্রশ্ন

ফাহিমদ-উর-রহমান



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

সেকুলারিজম প্রশ্ন	১১
মুসলিম সাহিত্যসমাজ : পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্বেষের সাংস্কৃতিক পটভূমি	৩১
আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল	৬১
হুমায়ুন কবির : আমাদের সেকুলার হয়ে ওঠার বিপদ	৭৯
সৈয়দ মুজতবা আলী : জাতীয়তাবাদের দোলাচল	৮৮

সেকুলারিজম প্রশ্ন

০১

নৃবিজ্ঞানী তালাল আসাদ হলেন জগদ্বিখ্যাত ইসলামবিদ মোহাম্মদ আসাদের পুত্র। পিতার মতো পুত্র সব সময় একই রকম হবেন, এমন কোনো কথা নেই। তালালও সে পথে হাঁটেননি। তবে বিদ্বান পিতার বিদ্বান পুত্র এই সিলসিলা তিনি জারি রেখেছেন।

বিশ শতকের মাঝামাঝি মোহাম্মদ আসাদ তাঁর সৃষ্টিশীল লেখালেখির ভেতর দিয়ে ইসলামের জন্য এক স্বপ্ন তৈরি করেছিলেন। এই স্বপ্ন অধরা হলেও বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজও এই স্বপ্নের ভেতর দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎকে অবলোকন করতে চায়। তালাল পিতার এই স্বপ্নের শরিক হননি। তিনি যখন গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বিলাতে পড়াশোনা করতে যান তখন তিনি মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং তার লেখালেখিতে অনেক ক্ষেত্রে এই মার্কসবাদের যুক্তিগুলোর সম্যক ব্যবহার আমরা দেখি। কমিউনিজমের পতনের পর এই নৃবিজ্ঞানী পণ্ডিতের পশ্চিমের অনেক মার্কসবাদী ভাবুর মতোই ভাবান্তর হয়। যাদেরকে উত্তর-আধুনিকতাবাদের পথিকৃৎ মনে করা হয়। এরা পশ্চিমের জ্ঞানকাঠামোকে সমালোচনা শুরু করেন। তালালের ভেতরেও এটা আমরা দেখি। তিনি নতুন অবস্থানে এসে পশ্চিমা আধুনিকতার অন্যতম খুঁটি সেকুলারিজমকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন এবং এর সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করতে আরম্ভ করেন। এক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিক ভাবুক মিশেল ফুকোর প্রভাব তার ওপর লক্ষ করা যায়।

তালাল সেকুলারিজমের ওপর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন, যা অ্যাকাডেমিয়ার জগতে বেশ প্রভাবশালী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বইগুলো হচ্ছে : *জিনিয়ালজিস অব রিলিজিয়ন, ফরমেশনস অব সেকুলার ও সেকুলার ট্রানসেলেশনস*। এসব বইয়ে সেকুলারিজম সম্পর্কে তিনি আমাদের নতুন ধারণা দিয়েছেন এবং গতানুগতিক আলোচনার বাইরে সেকুলারিজমের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তার এসব আলোচনা ঠিক প্রথাগত ধর্মীয় পটভূমি থেকে আসেনি। সেকুলার জ্ঞানকাণ্ডের ভেতরে থেকেই ইউরোপে উদ্ভূত এই চিন্তা ও দর্শনের সাথে তিনি বোঝাপড়া করেছেন। একে বলা যায়—*Secular critique of the secular*.

তালালের এ আলোচনা ও পর্যবেক্ষণগুলোকে আমরা এভাবে সারসংক্ষেপ করতে পারি :

১. ধর্মের সাথে লড়াই করে সেকুলারিজমের পয়দা হলেও তালালের কথা হলো, সেকুলারিজমেরও ধর্মের মতো চরিত্র-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধর্মের যেমন উৎসব আছে, আইকন আছে, তীর্থস্থান আছে, প্রথা ও রীতি আছে সেকুলারিজমেরও একই রকম প্রথা-পদ্ধতি বর্তমান। ধর্মীয় পুরুষদের মতো সেকুলার নেতাদেরও একই রকম দেবত্ব আরোপ করা হয়। ধর্মের রীতিকে চ্যালেঞ্জ করলে ব্লাসফেমির মতো ঘটনা ঘটে। তেমনই সেকুলার রীতিকে চ্যালেঞ্জ করলে রাষ্ট্র এসে তাৎক্ষণিক টুটি চেপে ধরে। তালাল লিখেছেন—

‘However, I am not persuaded that because national political life depends on ceremonial and on symbols of the sacred, it should be represented as a kind of religion—that it is enough to point to certain parallels with what we intuitively recognize as religion.’^১

২. ইউরোপে যখন সেকুলারিজমের পয়দা হয়, তখন বলা হয়েছিল রাষ্ট্র বা গণজীবন থেকে ধর্মকে দূরে হটিয়ে দিতে পারলে নাগরিকদের ভেতরে বৈষম্য থাকবে না এবং ধর্মীয় হানাহানির পথ বিলুপ্ত হবে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? ইউরোপ-আমেরিকার ইতিহাস থেকে দেখছি, ধর্মীয় সন্ত্রাস রাতারাতি জাতীয় রাষ্ট্র ও উপনিবেশিক সন্ত্রাসে পরিণত হলো। সেকুলারিজম তার রিজন প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে দেশে ঢের সন্ত্রাস করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে ফ্রিডম ও লিবার্টির সমর্থক মনে করে। এই ফ্রিডম বা লিবার্টি যুক্তরাষ্ট্রের নিজের মতো করে বানানো লিবার্টি, সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য গ্রহণযোগ্য লিবার্টি নয়। এই লিবার্টির কেউ প্রতিবাদ করলে সে লিবার্টির শত্রু হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং আইনি বা বেআইনি সন্ত্রাসের শিকার হয়। তালাল তাই যথার্থ লিখেছেন—

‘A secular state does not guarantee toleration; it puts into play different structures of ambition and fear. The law never seeks to eliminate violence since its object is always to regulate violence.’^২

৩. সেকুলারিজমের সাথে প্রায়শই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে যুক্ত করে দেখা হয়। কিন্তু কার্যত বহুক্ষেত্রে সেকুলারায়ন প্রক্রিয়ার সাথে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা যুক্ত থাকে এবং সেকুলারিজমকে কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো বিরোধী মত দমনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। তালালের কথায়—

‘Of course, secularization has been undertaken not only by liberal democratic states but by authoritarian states, too, and this only shows how ambiguous liberal language is, how committed both

types of secular state are, above all, to the definition and maintenance of modern power.’^৩

৪. সেকুলারিস্টদের কথা হলো, রাষ্ট্রে সব নাগরিকের সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হলে ব্যক্তি ও গণজীবনের পৃথক সীমানা থাকা চাই। কিন্তু আদতে সেকুলার রাষ্ট্র তার আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাগরিকদের ব্যক্তি পরিসরেও হানা দিয়ে থাকে। তালালের তাই সংগত প্রশ্ন—

‘Secularists accept that in modern society the political increasingly penetrates the personal. At any rate, they accept that politics through the law, has profound consequences for life in the private sphere. So why the fear of religious intrusion into private life?’^৪

৫. সেকুলারিজম ধর্মের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের তুমুল বিরোধী। এ কারণে এটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ও চিন্তাকে দমন করার চেষ্টা করে, যাতে তাদের ভাষায় অসহিষ্ণুতা মাথা চাড়া না দেয়। এক্ষেত্রে সেকুলারিজম কেন্দ্রীভূত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার দিকেই পা বাড়ায়। পাশাপাশি তাত্ত্বিকভাবে এটিতে তার অবিশ্বাসের কথাই ঘোষণা করে।

আমাদের এখানে সেকুলারিজমের বয়ান যারা নির্মাণ করেছেন, তাদের বড়ো একটা অংশ প্রগতিশীল বলে পরিচিত এবং হয় কমিউনিস্ট অথবা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন। এ দেশে আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা কিংবা কমিউনিজমের চর্চা— যাই বলি না কেন, কোনো সেকুলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হয়নি এটা ঐতিহাসিক সত্য। কলোনির যুগে কলকাতার এলিট হিন্দুদের ঔরসে এবং ব্রিটিশদের ব্যবস্থাপনায় যে বেঙ্গল রেনেসাঁর পত্তন হয়েছিল, সেটাকে অনেকে এ দেশে আধুনিকতা বলে স্তব করলেও এটা কোনো সেকুলার ঘটনা ছিল না।

বেঙ্গল রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে যে রাজনীতি ও সংস্কৃতি তৈরি হলো, তার কোনো জাতীয় পরিচয় তৈরি হয়নি। হিন্দুদের হেজিমনি আকারে সেদিন যে রাজনীতি বা সংস্কৃতি খাড়া হলো, সেখানে বাংলাভাষীদের বড়ো শরিক বাঙালি মুসলমানের যেমন জায়গা হলো না, তেমনি তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও পরিত্যাজ্য হয়ে রইল। সেই কালে বাঙালি মানে দাঁড়াল হিন্দু জাতির সমার্থক। তার মানে যাহা হিন্দু তাহাই বাঙালি। এ কথার সহজ মানে দাঁড়াল মুসলমানরা কেউ বাঙালি নন। বেঙ্গল রেনেসাঁ নামের এই হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প সেদিন বাঙালির সংজ্ঞা তৈরি করল। এই এথনিক বাঙালিত্ব যারা মেনে নিতে চাইল না বা এই বাঙালিত্বকে যারা চ্যালেঞ্জ করল, তাদেরকে বলা হলো সাম্প্রদায়িক। আর যারা এই হিন্দুত্ববাদী বাঙালি প্রকল্পের অংশীদার হলো, তাদেরকে বলা হলো অসাম্প্রদায়িক, উদার ও প্রগতিশীল। লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, বাঙালি মুসলমানের শিরে সেই থেকে এই সাম্প্রদায়িকতার তকমাটা আজও জুড়ে আছে।

বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প প্রথমবারের মতো ধাক্কা খায় ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়। বঙ্গভঙ্গ কায়েমের পর কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটরা ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে যে, পূর্ববঙ্গে তাদের জমিদারি আধিপত্য তছনছ হয়ে যেতে পারে এবং ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের কলকাতার সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখে। এটাই কলকাতা সহ্য করতে পারেনি। সেখানকার হিন্দু এলিটরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ফ্যান্টাসি শুরু করে। এই সশস্ত্র লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেয় ‘অনুশীলন’ ও ‘যুগান্তরে’র মতো দুটো গ্রুপ।

অনুশীলন ও যুগান্তর ছিল হিন্দু এলিট ও জমিদারদের স্বার্থের লোক। এখন বলা হচ্ছে, এরা নাকি স্বাধীনতার লড়াই করেছিল। অথচ এর আগে বাঙালি হিন্দুরা কোনোদিন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটা ঢিলও ছোড়েনি। নিজেদের জমিদারি আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকেই তারা এই সশস্ত্র উদ্যোগ নিয়েছিল। বিস্তৃত সশস্ত্র উদ্যোগ নিলেই সেটা যে বিপ্লবী হয়ে যাবে অথবা জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হবে, এমন কোনো কথা নেই। অত্যাচারী জমিদারদের স্বার্থের আন্দোলন

কীভাবে স্বদেশি আন্দোলন কিংবা সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী আন্দোলন হয়? এটা ছিল নিছক কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের স্বার্থের পক্ষের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

বাঙালি হিন্দুরা উপায়ান্তর না দেখে সে সময় বাঙালিদের নামে বাঙালি মুসলমানদের কাছে ডাকার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তারা ‘রাখীবন্ধন’ আর ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গান গেয়ে গেয়ে জাতীয় ঐক্যের ধূয়া তোলেন। কিন্তু বেঙ্গল রেনেসাঁর প্রকল্প তো ইতঃপূর্বে বাঙালির জাতীয় ঐক্যের পিঠে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছিল। তাই মুসলমানরা সেদিন রবীন্দ্রনাথের গানের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেনি।

বহুদিন পর রবীন্দ্রনাথ যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করে এই আন্দোলনের পরিণাম পর্যালোচনা করতে বসেন, তখন তার মনে এই প্রশ্নটা উদ্ভূত হয়—কেন এত বড়ো আন্দোলন মুসলমান সমাজকে নাড়া দিতে পারল না? তিনি যখন কালান্তরের বিখ্যাত লেখাগুলো লিখেছেন, তখন হিন্দু-মুসলিম সমস্যাটা গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। হিন্দুর জাতপাতের রাজনীতি মুসলমান সমাজকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, এটা তিনি হয়তো কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো, জমিদারদের বানানো অনুশীলন ও যুগান্তর পার্টি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে বিলীন হয়ে যায়। তার মানে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সাচ্চা সাম্প্রদায়িক কর্মীদের হাতে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয়। কমিউনিস্ট পার্টিতে এরা যোগদান করলেন বটে, কিন্তু এদের মনের সাম্প্রদায়িক কাঠামোটা তারা কখনো ত্যাগ করতে পারেনি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, এভাবে এ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি বেঙ্গল রেনেসাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করল। কমিউনিস্ট পার্টি তাই কখনো সেকুলার ও অসাম্প্রদায়িক হতে পারেনি; বরং সেকুলারিজমকে এরা হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশ বানিয়ে ছাড়ল। এরা যত বেশি অসাম্প্রদায়িকতা-প্রগতিশীলতার কথা বলে, বুঝতে হবে এটার তলায় হিন্দুত্ববাদের জামা লুকিয়ে আছে। আর এর শর্ত তৈরি হয়েছিল জমিদারদের হাতে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ : পূর্ববঙ্গে ইসলামবিদ্বেষের সাংস্কৃতিক পটভূমি

০৯

মুসলিম সাহিত্য সমাজ নিয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে এর পটভূমিটা একটু আলোচনা করা দরকার। তাহলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তৎপরতা বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা শহরে, ১৯২৬ সালে। এর মুখপত্রের নাম ছিল ‘শিখা’। এ কারণে এদেরকে শিখাগোষ্ঠীও বলা হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্ণধার ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলার শিক্ষক কাজী আবদুল ওদুদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের শিক্ষক আবুল হুসেন। এদের কর্মতৎপরতার মূলকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল। প্রধানত তরুণ মুসলিম ছাত্রদের অভিমুখ করেই এ প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ বছর আগে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত পিছিয়ে পড়া পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার ব্রাহ্মণরা এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এদের বিরোধিতার মুখে মুসলিম নেতারা অনেক লড়াই করে এ বিশ্ববিদ্যালয় শেষমেশ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

এর প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর মতো নেতারা চেয়েছিলেন এটি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হবে এবং বাঙালি মুসলমান তরুণরা আধুনিক শিক্ষা পেয়ে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পশ্চাদ্গামিতা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারবে। তারা প্রকৃতপক্ষে চেয়েছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে আলীগড়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড় হতে পারেনি। এর কারণ আমরা এখন একটু খতিয়ে দেখব।

প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্ররা ছিল সংখ্যালঘু। অন্তত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবধি। এর একটা প্রধান কারণ ছিল মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা নেবার মতো যথেষ্ট অর্থনৈতিক সংগতি ছিল না। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টিতে যোগ দেওয়ার মতো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম ছাড়া যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলমান শিক্ষক পাওয়া যায়নি। এই শূন্যতার সুযোগ নেয় বাঙালি হিন্দুরা এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল, তারা এসেই এটির ফ্যাকাল্টি ভরে ফেলে।

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বোধন কালেই এখানে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর শিক্ষানৈতিক ও অবকাঠামোগত টুলসগুলো হিন্দুদের হাত দিয়েই তৈরি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বেনিফিশিয়ারি হয় হিন্দুরাই। এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঠেকাতে না পারলেও হিন্দুরা এটিকে সাংস্কৃতিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডামি বানিয়ে ফেলে। ফলে এ প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুসলমান ছেলেরা বেরিয়ে আসে তারা মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো আবহাওয়া পায়নি। এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী ও বিপজ্জনক!

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে শিখাগোষ্ঠীর মতো একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উত্থান খুবই প্রশ্নবোধক। সেই কালে মুসলমান সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করাটা বড়ো একটা বিষয় ছিল। মুসলিম নেতারাও সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন। এইসব জরুরি প্রশ্ন এড়িয়ে শিখাগোষ্ঠীর নেতারা বললেন— মুসলমান সমাজ অনগ্রসর, পশ্চাদ্গামী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ধর্মে মোহাবিষ্ট। এর কারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিহিত। তাই ইসলাম ধর্মের একধরনের সংস্কারের পক্ষে তারা মতামত হাজির করলেন। এমনকি তারা শরিয়তের কিছু অংশ বর্জনের পক্ষেও মত দেন। তাদের মতে, এটা করলেই মুসলিম সমাজ শনৈ শনৈ প্রগতির পথে অগ্রসর হবে। শিখাগোষ্ঠীর এই রহস্যজনক তৎপরতা নিয়ে বাংলাদেশের একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী লিখেছেন—

‘ব্রিটিশ ভারতের দু শ বছর ইঙ্গ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের ভাষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য-ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে গিয়েছিল, সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে আপন ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজই ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের প্রধান কাজ। সে কাজটি কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ ও সৈয়দ আমীর আলীর মতো বাঙালি মুসলিম মনীষীরা অনেক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু শিখাগোষ্ঠী সেই পথে পা না বাড়িয়ে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনে নামলেন কলকাতার অনুকরণে মুসলিম সমাজকে ‘আধুনিক’, ‘প্রগতিশীল’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বানানোর উদ্দেশ্যে।

শিখাগোষ্ঠীর পয়লা মেন্টর ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি বরাবরই অখণ্ড ভারতীয় আদর্শে বিশ্বাস করতেন। ভারত বিভাগকে সমর্থন করেননি। এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাও তার কাছে অনভিপ্রেত ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং গান্ধী আদর্শের তিনটি মূলনীতির প্রতি তার আনুগত্য চিরকাল অটুট ছিল: সত্যগ্রহ, অহিংসা এবং চরকা।^৩

এই বিশ্বাসে তিনি এতখানি সবল ছিলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার পৈত্রিক বাড়ী ফরিদপুর হওয়া সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তানে না এসে ভারতে থেকে গিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে অনেক সুবিধাবাদী মুসলমানের মতো পাকিস্তানের আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও এখানে এসে অনেক কিছু গুছিয়ে নেওয়ার মানসিকতা তার ছিল না। এক্ষেত্রে তিনি আবু মোহাম্মদ হবীবুল্লাহ, শওকত ওসমান, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, হাসান আজিজুল হক প্রমুখের তুলনায় অনেক বেশি সৎ ও প্রগতিশীল ছিলেন বলে ধরে নেওয়াই যায়।

কাজী আবদুল ওদুদের যে প্রবন্ধটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত-সমালোচিত হয়েছিল, তার নাম ‘সম্মোহিত মুসলমান’। এ প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—‘ইসলামের ইতিহাস বহু পরিমাণে এক ব্যর্থতার ইতিহাস।’ এরকম কথা বোধ হয় ইসলামের বড়ো শত্রুরা কিংবা অসূয়াপ্রবণ ওরিয়েন্টালিস্টরাও খুব বেশি লিখতে পারেননি।

সভ্যতার ইতিহাসে উত্থান-পতন থাকে, থাকে সফলতা-ব্যর্থতাও। ইসলামেরও আছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, ইসলাম সভ্যতাকে কিছুই দেয়নি। এরকম অনৈতিহাসিক বাজে কথা ওদুদের মতো ভাবুকের কাছে প্রত্যাশিত নয়। এ ভুল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না অনিচ্ছাকৃত সেটা বলতে পারি না, তবে এসব কথা বলে মুসলিম সমাজের হিতৈষী দাবি করা একটু কঠিন কাজ বৈকি।

ওদুদ শরিয়তের বিরোধিতা করেছেন এবং এটির প্রত্যাবর্তনকে নাকচ করেছেন। অন্যদিকে রাসূলের প্রতি মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাকে তিনি পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। রাসূলের নবুয়তকে খাটো করে মনুষ্যত্বকে বড়ো করে দেখিয়েছেন। ‘সম্মোহিত মুসলমান’ প্রবন্ধ ছাড়াও ‘মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ও বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা’ প্রবন্ধে তিনি একই রকম আওয়াজ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার সবচেয়ে বিখ্যাত কিতাব *শাশ্বত বঙ্গ*-এ পাতার পর পাতাজুড়ে তিনি এসব কথার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন।

যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এসব ধর্মীয় সংস্কারের কথা বিভিন্ন ধর্মেও শোনা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, ধর্মের তো একটা নিজস্ব মোরাল কোড থাকে, ওয়ার্ল্ড অর্ডার থাকে, রিভিলড প্রিন্সিপল থাকে—এগুলো বাদ দিলে ধর্ম থাকে না। যুগ যুগ ধরে ধর্ম যে টিকে থাকে এবং মানুষের অগ্রগতির সাথে চলমান থাকে, এর কারণ হচ্ছে ধর্মেরও একটা নিজস্ব অন্তর্গত ডায়নামিজম থাকে। এই

ডায়নামিজমের জোরে ধর্ম যুগোপযোগিতাকে আত্মস্থ করে এবং সদাসক্রিয় বিশ্বপ্রক্রিয়ার সাথে অংশগ্রহণ করে। ধর্মের এই ডায়নামিজম ওদুদ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তিনি বারবার মুসলমান সমাজের অচলায়তন, পরিবর্তনহীনতা ও পরিবর্তনবিমুখতার জন্য আফসোস করেছেন। সেকালের বাঙালি মুসলমানের অচলায়তন ও অস্বস্তির প্রধান কারণ ছিল বৈরী রাজনৈতিক-সামাজিক দুর্যোগ, যার কথা ওদুদের লেখায় দেখতে পাওয়া যায় না। মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার সামাজিক কার্যকারণ উদ্ধার না করে তিনি খামোখা এর জন্য ইসলামকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন।

যেকালে ওদুদ এসব কথা লিখেছেন, সে সময়েও মুসলমান সমাজে নব নব সংস্কার প্রচেষ্টা চলছে। একদিকে মুফতি আবদুহ, রশিদ রিদা, অন্যদিকে ইকবালের মতো যুগন্ধর ব্যক্তির মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন নতুন নীতি ও প্রস্তাব পেশ করেছেন। এগুলো কি ওদুদের চোখে পড়েনি?

মুসলমান সমাজের রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাকে ওদুদ রীতিমতো পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করেছেন। এটা ওদুদের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় বৈকি। ইসলামের মতো তৌহিদবাদী বা একেশ্বরবাদী ধর্ম আর একটিও পৃথিবীতে নেই। তৌহিদ হচ্ছে এই ধর্মের সারাৎসার। এই ধর্মের অনুসারীরা তাদের নবিকে ভালোবাসে—এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের নবিকে পূজা করে এরকম নজির ইতিহাসে নেই। আবার নবুয়ত ছাড়া রাসূলের প্রকৃত মর্যাদা কোথায়? এ যেন শাস ছাড়া ফলের খোসা নিয়ে টানাটানি। কোনো মুসলমান যদি ঘুণাঙ্করেও এরকম চিন্তা লালন করে, ইসলামে তার স্থান হবার সম্ভাবনা কম। এসব অনভিপ্রেত কথাবার্তা বলে ওদুদ ইসলাম ধর্মকেও কলুষিত করতে চেয়েছেন।

ওদুদ ধর্মের এক নতুন সংজ্ঞা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা বাদ দিয়ে ধার্মিকতার ওপর জোর দিয়েছেন। আনুষ্ঠানিকতাকে তিনি ধর্মের চিহ্ন মানতে রাজি হননি। এও এক ওদুদের অদ্ভুত আবিষ্কার। এ যেন মেঘ ছাড়া বৃষ্টির প্রত্যাশা।

চার্টের সার্ভিস ছাড়া কি খ্রিষ্টধর্ম থাকবে? দূর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, দিওয়ালী ছাড়া কি হিন্দু ধর্ম সম্ভব? ওদুদরা বারবার যুক্তিশীলতা, কাণ্ডজ্ঞানের কথা বলেছেন। কিন্তু ওদুদের এসব কথাবার্তায় যুক্তির ভার নেই বললেই চলে।

মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও তার নেতা কর্মীরা এ দেশে প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ইসলামকে মোকাবিলা করা শুরু করে। ইসলামের থিওলজিকাল বিষয়-আশয় নিয়েও প্রশ্ন শুরু করে। শিখাগোষ্ঠীর সাথে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা কেউই শাস্ত্রবিদ বা আলেম ছিলেন না। ইসলামের থিওলজিকাল বিষয়ে তাদের যে খুব গভীর অধিকার ছিল, এমন বলা যাবে না। তারপরেও তারা থিওলজিকাল বিষয়ে অনধিকারচর্চাই করেছিলেন বলা চলে। আধুনিক কালে ইসলামের অকার্যকর হয়ে যাওয়া, ইসলামি শরিয়তের অংশত বর্জন, রাসূল (সা.)-এর নবুয়তকে গুরুত্বহীন মনে করা প্রভৃতির মতো বেপরোয়া কথাবার্তাও তারা বলেছিলেন।

ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিকতাকে তাদের কাছে গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা, অন্ধ বিশ্বাস, আড়ষ্ট বুদ্ধি, অতীতমুখিতা বলে মনে হয়েছিল। মনে হয় তাদের যত ক্ষোভ ছিল মোল্লা-মৌলভিদের ওপর। তাদের মনে হয়েছিল, এরাই ইসলামকে পিছু টেনে ধরেছে। তাই মধ্যযুগে ইউরোপের চার্চের মতো মোল্লাতন্ত্রকে তারা আক্রমণ করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে, চার্চের মতো ইসলামে মোল্লাতন্ত্রের কোনো জায়গা নেই এবং কখনো ছিল না। আলেমরা আমাদের সমাজে ইসলামি নৈতিকতার ঝাড়াটি ঐতিহাসিক কাল ধরে উঁচু করে ধরে আছেন। হয়তো এটাই ছিল তাদের বিরাগের কারণ।

বাঙালি মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ ছিল ঔপনিবেশিক জুলুম ও প্রতিকূলতা। আশ্চর্য হয়ে যাই, শিখাগোষ্ঠীর লেখকরা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেননি; বরং কখনো কখনো ইংরেজদের প্রতি অনুরাগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে শিখাগোষ্ঠীর ইসলামকে নিয়ে অপ্রীতি প্রকট অন্ধতার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তাই ‘যা কিছু হারায়, কেউ বেটাই চোর’-এর মতো ইসলামের দিকেই এরা নির্বিচারে তির নিষ্ক্ষেপ করে গেছেন। ওদুদের *বাংলার জাগরণ* গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন কবির এই অন্ধতার দিকে ইঙ্গিত করে লিখেছেন—

‘সত্যের সন্ধানের মধ্যেও কিন্তু বারবার জাতীয় অভিমান, সামাজিক সংকীর্ণতা এবং অন্যান্য ধরনের মানবধর্ম বিরোধী মনোভাব এসে পড়ে। বাংলাদেশের জাগরণের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যারা বুদ্ধির মুক্তির দোহাই দিয়েছেন, তাঁরাও বহুক্ষেত্রে মনেপ্রাণে সংস্কারের দাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে—সংস্কার বিদেশজাত, কিন্তু স্বদেশিই হোক, আর বিদেশিই হোক, যেখানে বুদ্ধির সহজ প্রবাহকে আচার বা অভ্যাসে ব্যাহত করেছে, সেখানেই মানবধর্ম ঘা খেয়েছে। যারা বুদ্ধির মুক্তি ও মানব কল্যাণকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন, তাঁদেরও সময় সময় পদস্খলন হয়েছে।’^{১৬}

বলাই বাহুল্য, আমাদের সমাজে শিখাগোষ্ঠীর লেখকরাই প্রথম সাংস্কৃতিকভাবে ইসলাম নিয়ে সংশয়, সন্দেহ ও হীনম্মন্যতা তৈরি করে। হয়তো বলা যায়, কিছুটা নাস্তিকতাও প্রচার করে। আজকে

আমাদের মধ্যবিত্তের মধ্যে ইসলাম নিয়ে যে টানাপোড়েন দেখি, তার প্রথম বীজ রোপিত হয় এদের হাতেই।

শিখাগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা সমকালে কেউ গ্রহণ করেনি। কিন্তু এদের যুক্তি ভাষা পেয়ে যায় এ দেশে ভাষা আন্দোলনপরবর্তী ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকট উত্থানের ভেতর। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক মডেলটা নেওয়া হয়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু রেনেসাঁর শাঁস থেকে। শিখার মডেলও ছিল হিন্দু রেনেসাঁ।

ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে যে সেকুলার চিন্তার বিকাশ ঘটে, তার পেছনে শিখার যুক্তিগুলোই অনেকখানি কার্যকর ছিল। ১৯৬০-এর দশকে বদরুদ্দীন উমরের লেখা *বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন* এবং ১৯৮০-এর দশকে আহমদ হুফার লেখা *বাঙালি মুসলমানের মন-এ* যে যুক্তি সাজিয়ে বাঙালি মুসলমানকে শাপশাপান্ত করা হয়েছে, তার বহু কিছু শিখার চিন্তা থেকে আহরিত। বিশেষ করে এ দুটো লেখার পূর্বসূরি হিসেবে ওদুদের *সম্মোহিত মুসলমান*-এর কথা বলা যেতে পারে।

ভাষা আন্দোলনপরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে যে বুদ্ধিবৃত্তিক সিলসিলা তৈরি হয়েছে, তা শিখারই বিলম্বিত স্বপ্ন পূরণ মাত্র। এই সিলসিলার মধ্যে আছেন আবদুল হক, আহমদ শরীফ, বদরুদ্দীন উমর, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ। এদের চিন্তাচর্চার মধ্যে ইসলাম নেই। ইসলামকে কোনোভাবেই এরা আত্মপরিচয়ের অংশ হিসেবে মনে করেন না; ইসলামকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতির বিকাশ তো দূরের কথা। আজকে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে ভাষা ও ধর্মের ভেতরে লড়াই বাধিয়ে যে রক্তাক্ত বিভাজন তৈরি করা হয়েছে, তার আদি উৎস খুঁজতে হবে শিখার চিন্তাভাবনার মধ্যে।

আবদুর রাজ্জাক থেকে আহমদ ছফা : সেকুলারিজমের পালাবদল

০৯

অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম জামানার ছাত্র ও পরবর্তীকালে শিক্ষক। সেই কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষক ছিল হাতে গোনা। তখন মুসলমানরা হিন্দু আধিপত্যের সামনে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে বলা চলে। রাজ্জাকের ভাষায়—

‘আমরা তখন বেশির ভাগ ধূতি-শার্ট পরতাম। তখনকার পিরিয়ডে দি মুসলিমস ওয়েয়ার কমপ্লিটলি সোয়েফট ওভার।’^১

রাজ্জাক ব্রিটিশ আমলের শেষটা দেখেছেন। তারপর পাকিস্তান আমলের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছেছেন। তাই তার এক জীবনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার রূপান্তরগুলো চোখে ধরা দিয়েছে এবং তিনিও অবস্থার সাথে মিলিয়ে কখনো কখনো বদলে গেছেন।

রাজ্জাকের ভেতরে কিছু ব্যতিক্রমী চরিত্র ছিল। তিনি সব সময় ঢাকাইয়া জবানে কথা বলতেন। এতে তার কোনো লজ্জা ছিল না। যেখানে তার বন্ধুবান্ধব ও শিষ্যকুল কলকাতাইয়া প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারলে উতরে যেতেন, সেখানে এসবের প্রতি তার কোনো ড্রাম্ফেপ ছিল না। ভদ্রলোক সাজার মরিয়া চেষ্ঠা তার মধ্যে বড়ো একটা দেখা যায়নি। ওই কলকাতাইয়া প্রমিত বাংলা নিয়েও তার নিজের মতো একটা বিচার ছিল—

‘আধুনিক বাংলা বঙ্গ সন্তানের ঠিক মুখের ভাষা না, লেখাপড়া শিইখ্যা লায়েক অইলে তখনই ওই ভাষাটা তার মুখে আসে।’^২

এই ঢাকাইয়া জবান ও সাধারণ জীবনযাপন সত্ত্বেও দেশে তার বিস্তর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। সমাজের উঁচু শ্রেণির সাথেই তার চলাফেরা ও খায়খাতির ছিল। তার শিষ্যকুলও ছিল সামাজিকভাবে প্রচণ্ড প্রভাবশালী। শিষ্যকুল তাকে ডায়জিনিস বলে ডাকতেন। হয়তো তার ওই ব্যতিক্রমী চরিত্রের জন্য।

ক্লাসিক্যাল টিচার বলতে যা বোঝায়, তিনি তা ছিলেন না। ছাত্র পড়ানো, ক্লাসে লেকচার দেওয়া, এগুলো তার ধাতে ছিল না। এসব না করার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে তার ঘনঘন বিরোধ হতো। কিন্তু শ্রেণিগত ও সামাজিক মর্যাদার কারণে তার অবস্থানের কখনো হেরফের হয়নি।

তবে তিনি মজলিসি আলোচনায় ছিলেন পারঙ্গম এবং এ ধরনের আলোচনা তার ভক্তকুলের কাছে রীতিমতো উপভোগ্য হয়ে উঠত। এসব বৈঠকী আলোচনায় তিনি তার চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করতেন ও ভক্তকুলকে কাছে টানতেন। জ্ঞানজগতের সাথেও তার একধরনের যোগাযোগ ছিল এবং দুনিয়ার পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে তার সজাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু অ্যাকাডেমিক অর্থে যে জ্ঞানচর্চা, তার দিকে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে শিক্ষক রাজনীতিতে লিপ্ত থাকতেন এবং দেনদরবার নিয়েও তাকে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত।

জীবনে তিনি তেমন কোনো লেখাজোখা করেননি। এ কারণে তার শ্রেণিবদ্ধ চিন্তার কোনো নমুনা আমাদের কাছে নেই। তিনি তার মজলিসি চণ্ডে যেসব আলোচনা করেছেন, তার কিছু নিয়ে আলাপচারিতা ও কথোপকথনের চণ্ডে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন তার দুই বিদ্বৎ শিষ্য সরদার ফজলুল করিম ও আহমদ ছফা। সরদারের বইটির নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গীয় সমাজ এবং আহমদ ছফার বইটি হলো যদ্যপি আমার গুরু। একে শ্রেণিবদ্ধ আলোচনা না বলে বলা যায়—Stray reflections—বিক্ষিপ্ত ভাবনারাজি।

কিন্তু আবদুর রাজ্জাকের কৃতি অন্যথানে, অন্তত তার বিদ্বৎ শিষ্যরা তাই মনে করেন। ভাষা আন্দোলন উত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে ৬০ ও ৭০ দশকে যে সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনাচিন্তার বিকাশ ঘটে, তিনি তার সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার ধারণাটি তার মাথা থেকেই আসে। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ এটি গ্রহণ করে।

তার শিষ্যকুলের মধ্যে পশ্চিমা উদারনৈতিক বুর্জোয়া, কমিউনিস্ট ও পাড় ভারতপন্থি সব জাতের লোকই ছিল। রেহমান সোবহান, কামাল হোসেন ও নুরুল ইসলামের মতো পশ্চিমাঘেঁষা; সরদার ফজলুল করিম, বদরুদ্দীন উমরের মতো পাড় কমিউনিস্ট, আনিসুজ্জামানের মতো ভারতপন্থি, ছফার মতো তরণ সমাজতন্ত্রী—সবাই তার আখড়ায় জমায়েত হয়েছিল। ওদিকে রেহমান সোবহান ও কামাল হোসেন ছিলেন উর্দুভাষী। মোটকথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হন বা নেতৃত্ব দেন, রাজ্জাক তাতে শুধু নেতৃত্বই দেন না—পুরো প্রক্রিয়াটিকেই তিনি সমন্বয় করেন।

দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুল, মুসলিম লীগের রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতা, টু ইকোনামির ধারণা—এসব চিন্তাভাবনা তার বাড়ির ড্রইংরুমে তৈরি হয় বলে শোনা যায়। প্রধানত তার পশ্চিমাঘেঁষা শিষ্যরা টু ইকোনামির আড়ালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক পটভূমি এবং কমিউনিস্ট ও ভারতপন্থি

শিষ্যরা সাংস্কৃতিক পটভূমিকে কাঠামোগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। কথা হলো— এই বিচিত্র ধরনের শিষ্যকুলকে তিনি কীভাবে সমন্বয় করেছিলেন?

তখনকার জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমীকরণে তার এই বিচিত্র শিষ্যকুল মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ হওয়ার পর দেখা গেল, ভারতপন্থি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা অন্যদের টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে, যার ফলে কমিউনিস্টদের রেডিকাল সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন ও উদারনৈতিকদের পশ্চিমা মডেলের সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভাবনা সব বেহাত হয়ে গেছে। এ রকম পরিবর্তনে রাজ্যাকের প্রতিক্রিয়া অনেকটাই নৈর্ব্যক্তিক। ভেতরে দোলাচল থাকলেও তার কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা দেখি না। এ সময় অনেকটা প্রতিক্রিয়াহীন নৈর্ব্যক্তিকতার ভেতরে উপমহাদেশের রাজনীতিকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়ার তিনি এক নীরব অংশীদার হয়ে থাকেন।

মজার ব্যাপার হলো, আবদুর রাজ্জাক পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতা ফজলুর রহমানের নির্বাচনি প্রচারে কীভাবে পায়ে হেঁটে কাজ করেছিলেন, তার এক সরস বর্ণনা দেখতে পাই সরদার ও ছফার বইতে। তিনি কী কারণে পাকিস্তান দাবির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তারও এক মজার কৈফিয়ত দিয়েছিলেন আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে ইসলামিক একাডেমিতে দেওয়া এক বক্তৃতায়। সে বক্তৃতার এক বয়ান আমরা দেখি ছফার জবানিতে—

‘আমি কইছিলাম আপনারা বাংলায় যত উপন্যাস লেখা অইচে সব এক জায়গায় আনেন। হিন্দু লেখক মুসলমান লেখক ফারাক কইরেন না। তারপর সব উপন্যাসে যত চরিত্র স্থান পাইছে রাম, শ্যাম, যদুমধু, করিম-রহিম নামগুলো খুঁইজ্যা বাইর করেন। তখন নিজের চৌকেই দেখতে পাইবেন, উপন্যাসে যেসব মুসলমান নাম স্থান পাইছে তার সংখ্যা পাঁচ পার্সেন্টের বেশি অইব না। অথচ বেঙ্গলে মুসলিম জনসংখ্যার পরিমাণ অর্ধেকের বেশি। এই কারণেই আমি পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানাইছিলাম।...

আহমদ ছফার মানস কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল ১৯৬০-এর দশকে। ছফা যেই প্রজন্মের প্রতিনিধি, সেই ষাটের দশকে এ দেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার উত্থান ঘটে। বাংলাদেশ আন্দোলনের পটভূমিতে এক বিশেষ ধরনের বাঙালি পরিচয় তখন নির্মিত হয়। এই পরিচয় যারা নির্মাণ করেছিলেন, তারা উনিশ শতকে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের তৈরি বাঙালি পরিচয়ের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন। অথচ এই পরিচয় নির্মাণে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত যে মূল জনগোষ্ঠী—বাঙালি মুসলমান, তার ঐতিহাসিক আত্মপরিচয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে আদৌ গণ্য করা হয়নি। উনিশ শতকে কলকাতার বর্ণহিন্দুরা যে সংস্কৃতি তৈরি করেছিল, সেটা ছিল তাদের ওয়ার্ল্ড অর্ডার, মোরাল কোড ও দৈনন্দিন লাইফ স্টাইলের বাই প্রোডাক্ট। অথচ এই ভিন্ন জাতের সংস্কৃতি দিয়ে একটা মুসলমান প্রধান সমাজকে যখন পরিচিত করার চেষ্টা করানো হলো, তখন থেকেই সংকটটা পাকিয়ে উঠল এবং বাংলাদেশের মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাটা দারুণভাবে বিঘ্নিত হলো। আজকে আমাদের দেশে জাতি পরিচয়গত যে সংকট, তার শুরু এখান থেকেই।

কলকাতায় তৈরি যে বাঙালি পরিচয়, সেটা ঐতিহাসিকভাবেই ছিল সাম্প্রদায়িক। কারণ, এটা বাঙালির বড়ো শরিক মুসলমানদের কোনো জায়গা দেয়নি। ফলে ঐতিহাসিক কারণে এই বাঙালি পরিচয় ষাটের দশকে বাঙালি মুসলমানের একসময়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফসল পাকিস্তানকেই প্রতিপক্ষ বানায় এবং পাকিস্তানের সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলাম মুসলমান পরিচয়কে ছুড়ে ফেলতে উদ্যত হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যেই ছফা তার যৌবন কাটিয়েছেন এবং পাকিস্তানি চিন্তার বাইরে এসে সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী হিসেবে নিজেকে শনাক্ত করেছেন। একই সাথে ছফার ভাবজগতে দোলা দিয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁর বোধ, কলকাতার রেনেসাঁর আবেগ আর সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়া। সেই হিসেবে তরুণ ছফার বুদ্ধিজীবিতাকে আমরা সেকুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদী, রেনেসাঁপন্থি ও সমাজতন্ত্রঘোঁষা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এর অতিরিক্ত হিসেবে ধর্মের ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট সহানুভূতিহীন মনে হয়, অন্তত তার বিস্তর লেখালেখি এর বড়ো প্রমাণ।

ছফার প্রজন্ম পাকিস্তান আন্দোলনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেনি। প্রচলিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বয়ানের মতোই তার ভাবনাচিন্তা আটকে ছিল। পাকিস্তান সম্পর্কে তার মত ছিল—

‘দুনিয়ার বুকে পাকিস্তান একটা বিসংগত রাষ্ট্র—এই রাষ্ট্রের সরকারি দর্শনও বিসংগত। ইসলাম, মুসলিম জাতীয়তা, ইসলামি রাষ্ট্র—এসব গালভরা মনোহর মিথ্যে বুলিই ছিল পাকিস্তানবাদী বুদ্ধিজীবীদের অত্যন্ত আদরের জিনিস।

অথবা

উনিশশ সাতচল্লিশের দেশ বিভাগ একটা প্রকাণ্ড রাজনৈতিক ভ্রান্তি।

কিংবা

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল।’^৮

ছফার লেখার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল গতিশীলতা, যা পাঠককে আকর্ষণ করে। কিন্তু একটা লেখাকে শক্তিশালী হতে হলে যুক্তি ও তথ্যনির্ভরতা খুবই প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে ছফা যার ধার ধারেননি; বরং সেখানে আবেগ এসে বেশি পরিমাণে জড়ো হয়েছে। এর ওপরে অভিযোগ করার একটা আবেগ তাকে গ্রাস করেছিল। এটা তার লেখার ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। ছফার পাকিস্তানবিষয়ক ভাবনা যতটা না যৌক্তিক, তার চেয়ে বেশি আবেগনির্ভর।

যাইহোক, ছফার ভাষায় পাকিস্তানের মতো মধ্যযুগীয় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা কি না পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল, তার থেকে মুক্তির জন্য তিনি ১৯৭১ সালে কলকাতায় চলে যান এবং বাংলাদেশের পক্ষে লড়াইয়ে নেমে পড়েন। তিনি বাংলাদেশ আন্দোলনকে শুধু পাকিস্তানের থেকে মুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেননি, তিনি এর ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের সমাজের ভেতরে একটা রূপান্তর চেয়েছিলেন, যার পরিণতিতে এখানে রেনেসাঁ আসবে এবং ইউরোপীয় কেতায় ধর্মের সংস্কারমুক্ত একটা যুক্তিশীল মানবিক সমাজ গড়ে উঠবে। এসব চিন্তার মধ্যে বিপ্লবের ফুলকি আছে, কিন্তু সমাজ বাস্তবতার দিক দিয়ে এটা কতটা যৌক্তিক ছিল সেটা পর্যালোচনা করাই যেতে পারে। ছফার বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদানের সাথে অন্যদের যোগদানের এটা একটা মৌলিক তফাত বলা যেতে পারে।